বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নেতা
শেখ হাসিনা
প্রতিষ্ঠাতা
আবদুল হামিদ খান ভাসানী
ইয়ার মুহাম্মদ খান
শামসুল হক
প্রতিষ্ঠা
২৩ জুন, ১৯৪৯
সদর দপ্তর
বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, ঢাকা
মতাদর্শ
বাঙালি জাতীয়তাবাদ,
গণতন্ত্র ,
ধর্মনিরপেক্ষতা ,
অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি,
সমাজতন্ত্র তথা শোষণমুক্ত
সমাজ ও সামাজিক
ন্যায়বিচার
রাজনৈতিক অবস্থান
কেন্দ্র-বামে
আন্তর্জাতিক অধিভুক্তি
না
জাতীয় সংসদে আসন
২৩২ / ৩০০
নির্বাচনী প্রতীক
ওয়েবসাইট
আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বাংলা অর্থ: বাংলাদেশ জনতা লীগ)[১] বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল। এই রাজনৈতিক দলটির গোড়াপত্তন হয় ২৩ জুন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী কালে এর নাম ছিল নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। ১৯৭০ সাল থেকে এর নির্বাচনী প্রতীক নৌকা ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা
যুদ্ধে
নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে
আওয়ামী লীগ পরিচিত।[২]
১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র
হিসাবে বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠার পর এই সংগঠনটির
নামাকরণ করা হয় বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগ।
প্রতিষ্ঠা
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ও আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন
তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক
মুসলিম লীগের একাংশের
সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯
সালের ২৩ জুন ঢাকার
টিকাটুলী র কেএম দাস লেন
রোডের রোজ গার্ডেন
প্যালেসে 'পূর্ব পাকিস্তান
আওয়ামী মুসলিম লীগ'
প্রতিষ্ঠিত হয়, যার সভাপতি
ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ
খান ভাসানী
এবং সাধারণ সম্পাদক
টাঙ্গাইলের শামসুল হক ।
পরবর্তীকালে, ১৯৫৫ সালে
মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে
ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা এবং
অসাম্প্রদায়িক চেতনা
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটির
নাম থেকে পরে 'মুসলিম' শব্দটি
বাদ দেওয়া হয়; নাম রাখা হয়:
'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী
লীগ'। [৩]
আওয়ামী লীগের জন্মসূত্রের
সঙ্গে ঢাকা ১৫০ নম্বর
মোগলটুলিস্থ পূর্ববঙ্গ কর্মী
শিবিরের উদ্যোগের সম্পর্ক
অনস্বীকার্য। ২৩ জুনের
সম্মেলনের আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা রাখেন শওকত আলী ।
তার উদ্যোগে ১৫০ নং
মোগলটুলি স্থ শওকত আলীর
বাসভবন এবং কর্মী শিবির

অফিসকে ঘিরে বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতিমূলক তৎপরতার পর ২৩ জুনের কর্মী সম্মেলনে দলের ঘোষণা দেয়া হয়। শওকত আলীর অনুরোধে কলকাতা থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি মামলা পরিচালনার কাজে ঢাকায় এলে তিনি শওকত আলীকে মুসলিম লীগ ছেড়ে ভিন্ন একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। শওকত আলী এ পরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবিরের নেতৃবৃন্দকে নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। এসময় কর্মী শিবিরের প্রধান নেতা ছিলেন শামসুল হক। কামরুদ্দীন আহমদ, মো. তোয়াহা , অলি আহাদ , তাজউদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান , আবদুল আউয়াল, মুহম্মদ আলমাস, শামসুজ্জোহা প্রমুখ প্রথম দিকে এবং পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্মী শিবির কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। মুসলিম লীগের আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের অন্যায় কাজগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার লক্ষ্যেই এখানে কর্মী শিবির গড়ে তুলেছিলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৪৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকা এলে তার সঙ্গে শওকত আলীর আলোচনা হয়। শওকত আলী মওলানাকে পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবিরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক তৎপরতার কথা জানান। এসময় মওলানা ভাসানী আলী আমজাদ খানের বাসায়

অবস্থান করছিলেন। শওকত আলীর সঙ্গে তার প্রাথমিক আলোচনা সেখানেই হয়। এই আলোচনার সূত্র ধরে নতুন দল গঠনের জন্য একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন শওকত আলী। সেজন্যে ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মওলানা ভাসানী সেই বৈঠকে যোগদান করেন। এসময় খোন্দকার আবদুল হামিদের সঙ্গে পরামর্শ করে শওকত আলীর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, ইয়ার মুহম্মদ খানকে সম্পাদক এবং খন্দকার মুশতাক আহমদকে দপ্তর সম্পাদক করে অন্যদেরসহ একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। [৪]

উপরোক্ত সাংগঠনিক কমিটি ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন রোজ গার্ডেনে নতুন দল গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এক সম্মেলন আহ্বান করে। রোজ গার্ডেনে ২৩ জুনের বিকেল ৩টায় সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, শওকত আলী, আনোয়ারা খাতুন, ফজলুল কাদের চৌধুরী , আবদুল জব্বার খদ্দর, খন্দকার মোশতাক আহমেদ , আতাউর রহমান খান, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ , আলী আমজাদ খান, শামসুদ্দীন আহমদ (কুষ্টিয়া), ইয়ার মুহম্মদ খান, মওলানা শামসুল হক, মওলানা এয়াকুব শরীফ, আবদুর রশিদ প্রমুখ। [৪]

প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সহ-সভাপতি হন আতাউর রহমান

খান, শাখাওয়াত হোসেন ও আলী আহমদ। টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ কে রফিকুল হোসেনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোষাধ্যক্ষ হন ইয়ার মোহাম্মদ খান। এসময় শেখ মুজিব কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন।
অন্যদিকে, পুরো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংগঠনটির নাম রাখা হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। এর সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
২৪ জুন বিকেলে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে প্রকাশ্যে জনসভা করে। সভায় আনুমানিক প্রায় চার হাজার লোক উপস্থিত হয়।
১৯৫২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। পরের বছর ঢাকার 'মুকুল' প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলনে তাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ১৩ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন শেখ মুজিব। উল্লেখ্য যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিলো তৎকালীন পাকিস্তানে প্রথম বিরোধী দল।
প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দলটি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ ৪২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। শুরুর দিকে দলটির প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে ছিল রাষ্ট্রভাষা

হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি,
এক ব্যাক্তির এক ভোট, গণতন্ত্র,
সংবিধান প্রণয়ন, সংসদীয়
পদ্ধতির সরকার, আঞ্চলিক
স্বায়ত্ত্বশাসন এবং তৎকালীন
পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের
মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ।
শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪
সালের নির্বাচনে মুসলিম
লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য
অন্যান্য দলকে সঙ্গে নিয়ে
যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে আওয়ামী
মুসলিম লীগ মুখ্য ভূমিকা পালন
করে। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর
দলটি কৃষক শ্রমিক পার্টি,
পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও
পাকিস্তান খেলাফত পার্টির
সঙ্গে মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।
১৯৫৪ সালের মার্চের আট
থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত
অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান
পরিষদের নির্বাচনে ২৩৭টি
মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট
২২৩টি আসন পায়। এরমধ্যে
১৪৩টি পেয়েছিল আওয়ামী
মুসলিম লীগ।
২৪ বছরের পাকিস্তান
শাসনামলে আওয়ামী মুসলিম
লীগ আতাউর রহমান খানের
নেতৃত্বে দু'বছর প্রদেশে
ক্ষমতাসীন ছিল এবং হোসেন
শহীদ সোহরাওয়ার্দীর
নেতৃত্বে কেন্দ্রে ১৩ মাস
কোয়ালিশন সরকারের
অংশীদার ছিল।
১৯৫৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত
দলের তৃতীয় সম্মেলনে দলের
নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ
দেওয়া হয়; নতুন নাম রাখা হয়:
'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী
লীগ'।
পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে
মতপার্থক্যের কারণে ১৯৫৭
সালে দল ভাঙন দেখা দেয়। ওই

বছরের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি
কাগমারি সম্মেলনে দলে
বিভক্তির ঘটনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
এ অবস্থায় মাওলানা
ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী
পার্টি (ন্যাপ) নামে একটি নতুন
রাজনৈতিক দল গঠন করেন। [৫]

মূলনীতি

বাঙালি জাতীয়তাবাদ,
গণতন্ত্র , ধর্মনিরপেক্ষতা তথা
সকল ধর্মের স্বাধীনতা
নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক
রাজনীতি এবং সমাজতন্ত্র
তথা শোষণমুক্ত সমাজ ও
সামাজিক ন্যায়বিচার
প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগের মূলনীতি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশের স্বাধীনতা
সংহত করা এবং রাষ্ট্রের
সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সমুন্নত
রাখা। খ. প্রজাতন্ত্রের
মালিক জনগণ। জনগণের
সাংবিধানিক অধিকার
প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা। গ.
রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক
মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত
করা। ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
একটি অসাম্প্রদায়িক,
গণতান্ত্রিক সমাজ ও
রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পররাষ্ট্রনীতি

সকলের সাথে বন্ধুত্ব। কারও
প্রভুত্ব নয়, কারো সাথে
বৈরিতা নয়।

সরকার গঠন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৪
সালের যুক্তফ্রন্ট-সরকার গঠন
করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে
আওয়ামী লীগ ২৬৯ আসনের

মধ্যে ২৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ও শোষণের ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ সংগ্রাম করে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩০টি আসন লাভ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে।

আন্দোলন

৬ দফা আন্দোলন

ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য- পাকিস্তান হবে একটি Federal বা যৌথরাষ্ট্র এবং ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই Federation বা যৌথরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে । পরবর্তীতে এই ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করা হয়।

ছয় দফা দাবি -এর দাবিগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম দফা : সরকারের বৈশিষ্ট হবে Federal বা

যৌথরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয়
পদ্ধতির; তাতে
যৌথরাষ্ট্রের
অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার
নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং
সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক
ভোটাধিকারের
ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয়
ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি
নির্বাচন
জনসংখ্যারভিত্তিতে হবে।
দ্বিতীয় দফা : কেন্দ্রীয়
সরকারের দায়িত্ব থাকবে
কেবল প্রতিরক্ষা ও
বৈদেশিক বিষয় এবং তৃতীয়
দফায় ব্যবস্থিত শর্তসাপেক্ষ
বিষয়।
তৃতীয় দফা : পুর্ব ও পশ্চিম
পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক
মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করতে
হবে, যা পারস্পরিকভাবে
কিংবা অবাধে উভয়
অঞ্চলে বিনিময় করা চলবে।
অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা
হিসেবে একটি মুদ্রা-
ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে
এই শর্তে যে, একটি
কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা
প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার
অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি
রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।
তাতে এমন বিধান থাকতে
হবে যেন এক অঞ্চল থেকে
অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর
কিংবা মূলধন পাচার হতে
না পারে।
চতুর্থ দফা : রাজস্ব ধার্য ও
আদায়ের ক্ষমতা থাকবে
অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে।
প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক
বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য
কেন্দ্রীয় সরকারকে
প্রয়োজনীয় রাজস্বের

pdf created by Toufek 01780862335

যোগান দেয়া হবে।
সংবিধানে নির্দেশিত
বিধানের বলে রাজস্বের
এই নির্ধারিত অংশ
স্বাভাবিকভাবেই
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে
জমা হয়ে যাবে। এহেন
সাংবিধানিক বিধানে
এমন নিশ্চয়তা থাকবে যে,
কেন্দ্রীয় সরকারের
রাজস্বের প্রয়োজন
মেটানোর ব্যাপারটি এমন
একটি লক্ষ্যের সাথে
সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যেন
রাজস্বনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ
ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে
অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে
থাকে।
পঞ্চম দফা : যৌথরাষ্ট্রের
প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যে
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে,
সেই অঙ্গরাজ্যের সরকার
যাতে স্বীয়
নিয়ণ্ত্রনাধীনে তার পৃথক
হিসাব রাখতে পারে,
সংবিধানে সেরূপ বিধান
থাকতে হবে। কেন্দ্রীয়
সরকারের যে পরিমাণ
বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন
হবে, সংবিধান নির্দেশিত
বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত
অনুপাতের ভিত্তিতে
অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে তা
আদায় করা হবে। সংবিধান
নির্দেশিত
বিধানানুযায়ী দেশের
বৈদেশিক নীতির
কাঠামোর মধ্যে, যার
দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয়
সরকারের হাতে, বৈদেশিক
বাণিজ্য ও বৈদেশিক
সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি
সম্পাদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক
বা প্রাদেশিক সরকারগুলোর

হাতে থাকবে।
ষষ্ঠ দফা : ফলপ্রসূভাবে
জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার
কাজে সাহায্যের জন্য
অঙ্গরাজ্যগুলোকে
মিলিশিয়া বা আধা-
সামরিক বাহিনী গঠনের
ক্ষমতা দিতে হবে।
ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং
বাংলাদেশ আওয়ামী
লীগের নেতৃত্বে
বাংলাদেশের রাজনীতিক
সংগ্রামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ।
এক দশকের বেশি সময় ধরে
ক্ষমতায় থাকা আইয়ুব খান
সরকারের পতন ঘটে এই
অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। এই
সময়ে শেখ মুজিব এবং
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ
আরো কিছু ছাত্র সংগঠন এক
সাথে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম
পরিষদ গঠন করে তাদের
ঐতিহাসিক এগারো দফা
কর্মসূচী পেশ করেন যা মূলত
বাংলাদেশের স্বাধীনতা
আন্দোলনকে হিসেবে
সহায়তা করে।
একাত্তরের স্বাধীনতা
আন্দোলন
গণআন্দোলন ও আইয়ুবের পতনের
পটভূমিতে '৭০ এর নির্বাচনে
কেন্দ্রীয় আইনসভায় (জাতীয়
পরিষদ) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব
পাকিস্তান থেকে ১৬৯
আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন দখল করে
আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসন-
বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয়
পরিষদে নিরঙ্কুশ
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে
এবং সরকার গঠনে ও শাসনতন্ত্র
প্রণয়নের যোগ্যতা অর্জন করে।
প্রাদেশিক পরিষদের আসনের

মধ্যে ২৮৮ আসন পায় দলটি।
জাতীয় পরিষদের সাতটি
মহিলা আসন এবং প্রাদেশিক
পরিষদের দশটি মহিলা আসনের
সবগুলোতেই জয়ী হয় আওয়ামী
লীগ। [৬]
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও
আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে
আমন্ত্রণ জানানোর পরিবর্তে
সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান
সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে
বাঙালির অধিকার নস্যাৎ
করার পথ বেছে নেয়।
স্বৈরাচার বিরোধী
আন্দোলন
১৯৮৭ সালে তৎকালীন
রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট
জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ
এরশাদের স্বৈরাচারের
বিরুদ্ধে সংগঠিত গণতন্ত্র
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আওয়ামী লীগ সক্রিয়ভাবে
অংশ গ্রহন করে। এই আন্দোলন
চলাকালে ১০ই নভেম্বর
পুলিশের গুলিতে যুবলীগ কর্মী
নূর হোসেন নিহত হন।
জোট গঠন
৯ম জাতীয় সংসদে আওয়ামী
লীগ
২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ এ অনুষ্ঠিত
সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী
লীগের নেতৃত্বাধীন
মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয়
অর্জনের পর ৬ জানুয়ারি ২০০৯-এ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকারের প্রধানমন্ত্রী
হিসেবে দ্বিতীয়বারের মত
শপথ নেন শেখ হাসিনা। ২
জানুয়ারি ২০০৯ নবম জাতীয়
সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী
প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা
গেজেট আকারে প্রকাশ করে
নির্বাচন কমিশন । ৩ জানুয়ারি
২০০৯ স্পিকার ব্যারিস্টার

জমিরউদ্দিন সরকার
সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের
৩য় তফসিলের ৫ বিধি অনুযায়ী
আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন
মহাজোট ও স্বতন্ত্র ২৫৮ জন সংসদ
সদস্যের শপথ বাক্য পাঠ করান।
প্রথম দিনে শপথ গ্রহণকারীদের
মধ্যে আওয়ামী লীগের ২২৭ জন,
জাতীয় পার্টির ২৫ জন,
জাসদের ৩ জন, ওয়ার্কার্স
পার্টির ২ জন ও স্বতন্ত্র ১ জন
সংসদ সদস্য ছিলেন। শপথ গ্রহণের
আগে মহাজোট নেত্রী শেখ
হাসিনা গোপালগঞ্জ-৩ আসন
রেখে বাকি দুটি আসন
(রংপুর-৬ ও বাগেরহাট-১)
ছেড়ে দেন। ৪ জানুয়ারি ২০০৯
আওয়ামী লীগের একজন,
এলডিপি'র একজন ও স্বতন্ত্র
তিনজনসহ মোট পাঁচজন সংসদ
সদস্য শপথ গ্রহণ করেন।
শপথ গ্রহণের পরপরই আওয়ামী
লীগ সংসদীয় দলের সভায়
নেতা হিসেবে নির্বাচিত
হন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী
শেখ হাসিনা। দলের প্রবীণ
নেতা জিল্লুর রহমানকে
উপনেতা নির্বাচন করা হয়।
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয়
নেতা হওয়ায় শেখ হাসিনাই

সংসদ নেতা। নবম জাতীয়

সংসদের চিফ হুইপ নির্বাচিত
হন অষ্টম সংসদের
বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ

উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ

pdf created by Toufek,
department of law.
university of Dhaka